আজকের কাগজ

তারিখ 27 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এস এস সি পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলাদেশের জন্মের আগে একবার শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বল্পকালীন নিরীক্ষা চালিয়ে ব্যর্থ হতে হয়। কোন ক্ষেত্রে নিরীক্ষা অপ্রীতিকর বা খারাপ, একথা মনে করার কোন প্রাথমিক কারণ নেই। তবে, নিরীক্ষার সময়ই যদি তার ফলাফল না দেখে বাস্তব প্রয়োগের কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শুভ পরিণতি লাভ নাও হতে পারে। কোন একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে যদি নিরীক্ষা করা হয় এবং নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি ভাল ফল লাভ করা যায়, সেক্ষেত্রে বাস্তবে তার প্রয়োগের কথা চিন্তা করা যায়। অবশ্য, এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন থেকে যায় তা হলো বাস্তব প্রয়োগ কতখানি উন্নতির সহায়ক ও পরিবেশ সম্মত, সেদিক চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে আকস্মিকভাবে সিলেবাস পরিবর্তন ও শিক্ষা পদ্ধতির ওপর যে নিরীক্ষা করা হয় তার পরিচালনা করেন সিলভার বার্ডেট নামে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান। তারা ঢাকায় এসে তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে অফিস করে চিত্তাকর্ষক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পাঠ্য পুস্তকগুলির পৃষ্ঠা ছিল উন্নত মানের। চিত্র আকর্ষণীয় ও মুদ্রণ আকর্ষণীয়। সিলভার বার্ডেট যে প্রথা এদেশে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ নতুন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে তা গ্রহণের পটভূমিকা না থাকায় ছাত্র সমাজ তা গ্রহণ করতে পারেনি। সম্ভবত শিক্ষক সমাজও। তার ফলে রাতারাতি যেমন সিলভার বার্ডেটের বই প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি রাতারাতিই এ দেশের বিদ্যালয় থেকে উঠে গিয়েছিল।

সিলভার বার্ডেট শিক্ষাঙ্গনে নতুন পদ্ধতি নিয়ে নিরীক্ষা করে ব্যর্থ হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে চার বছর আগে এস এস সি ও এইচ এস সি পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া প্রচলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে ছাত্র সমাজের মনোভাব গড়ে ওঠে। নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি অবশ্যই আছে। তবে, এই প্রক্রিয়ার পক্ষে মান বন্টনের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে (বাংলা ও ইংরেজী) একশো নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে রাখলে শিক্ষার্থীর ভাষা চর্চার পরিধি হ্রাস হয়ে পড়ে। সাহিত্য বিষয়ে ভাষা অনুশীলন যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা যে কোন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অভিভাবক বিশেষভাবে জ্ঞাত। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্যে পঞ্চাশ নম্বর রাখার কারণে শিক্ষার্থীর জন্যে বর্ণনাত্মক প্রশ্নের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। বর্ণনাত্মক প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব কিনা তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিন্তা করে দেখতে পারেন।

সিলভার বার্ডেট ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পর এ বছর থেকে পরীক্ষার ফল প্রকাশে নতুন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। নতুন পদ্ধতির উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুললেও এর প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়। এই পদ্ধতি অবলম্বনে এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শুধু এই পদ্ধতি নয়, বোর্ডও যেভাবে প্রধান পরীক্ষকদের নিয়োগদান করেছেন সে সম্পর্কেও কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও উত্তরপত্র নিরীক্ষার পদ্ধতিটি অভিনব কিনা প্রথমেই তা বিচার করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের উত্তর পত্র আমেরিকা থেকে মুদ্রিত। এর ফলে দুটো সংলগ্ন প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে। এক, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে আমেরিকা থেকে উত্তর পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা মুদ্রণ কতখানি যুক্তিসঙ্গত। বিদেশে মুদ্রণের ফলে যে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়েছে তার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এদেশেই এর চেয়ে অনেক অল্প ব্যয়ে এই শ্রেণীর পরীক্ষার উত্তর পত্র মুদ্রণ করা যেত। শুধু মুদ্রণই নয়, আমেরিকা থেকে কভার আনার জন্যেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এটা অনায়াসেই অনুমান যোগ্য। দ্বিতীয়ত, উত্তর পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা দেশে মুদ্রণ না করার অর্থ যদি দুটো দিক হয়, তাহলেও তা সমর্থন যোগ্য নয়। এক, এদেশের প্রকৌশলী ও প্রেস এই শ্রেণীর উত্তর পত্র মুদ্রণের অযোগ্য। দুই, যে দেশের প্রকৌশলী ও প্রেস উত্তর পত্র মুদ্রণের অযোগ্য সে দেশের পরীক্ষকরা কিভাবে এই খাতে পরীক্ষণের পর কম্পিউটারের সাহায্যে ফল প্রকাশ সম্ভব তাও তর্কতীত নয়। এই দিকগুলি উত্তর পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা বিদেশে মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত।

উত্তর পত্র পরীক্ষণ ও ফলাফল প্রকাশ যাতে নিরপেক্ষ হয় এই আদর্শ সামনে রেখে নতুন উত্তর পত্রে উদ্ভাবন হলে, তার বিপক্ষেও যুক্তি স্থাপন সম্ভব। যদি এই মত গ্রহণ করা যায় যে, এই প্রক্রিয়ায় উত্তর পত্র নিরপেক্ষভাবে দেখা সম্ভব তাহলে যে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এতদিন যেভাবে পরীক্ষকরা উত্তর পত্র দেখেছেন, তা কি নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষিত হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। তার কারণ শুধু নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে সবাইকে অর্বাচীনরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া এই প্রশ্নের সঙ্গে কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত আছে। দু'একজন শিক্ষকের কাজে গাফিলতির জন্যে স্কুল ও কলেজের সমস্ত শিক্ষককে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। পরীক্ষকদের অবিশ্বাসী রূপে চিহ্নিত করার যৌক্তিক কারণগুলি নির্দেশের প্রয়োজন। তাছাড়া অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকদের অনায়াসেই পরীক্ষকদের তালিকা থেকে বর্জন করা সম্ভব।

পরীক্ষার উত্তর পত্রে প্রতীকী চিহ্নের মাধ্যমে কোড নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে। এক একটি উত্তর পত্রে স্বতন্ত্র ধরনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত। ঢাকা বোর্ডে

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার অনেক বেশি সময় পায় এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণের একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম আছে। এ জন্যে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভাল ফলাফল করে। এর জন্যে ক্যাডেট কলেজের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের খাতার অবমূল্যায়ন যুক্তিসংগত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডগুলির চিন্তা করা উচিত শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন করে তাদের সেই মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ ক্ষেত্রে শুধু পদ্ধতির পরিবর্তন নয়। মানসিকতা পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। এই দুই মূল্যবোধ একত্রিত হলে শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত বিচার সম্ভব।

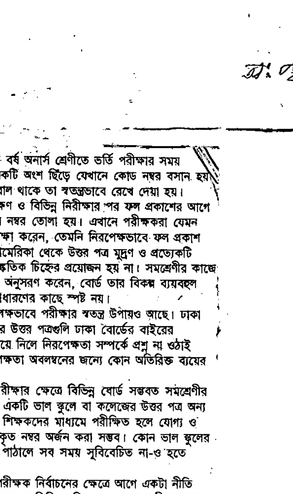

দেড় লাখ পরীক্ষার্থী হলে দেড় লাখ সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন। সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহারে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর বর্জন করা একটা ভাল পদ্ধতি। এক, পরীক্ষার্থীরা কোন উত্তর পত্রের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ না করে যথাযথভাবে নিরীক্ষা করতে সক্ষম। দুই, বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীর আত্মীয়-স্বজন প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষকের বাড়িতে গিয়ে নম্বর বাড়াতে পারবেন না। কিন্তু এই সঙ্গে অন্য দুর্বল দিকটিও জড়িত। উত্তর পত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ডি-কোড করার সময় কমপিউটারের টেকনিশিয়ানরা যে ভুল করবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? কমপিউটারের ধারণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু মানুষের মত মস্তিষ্ক নেই। কোন টেকনিশিয়ানের ভ্রমাত্মক প্রোগ্রামের জন্যে যে-কোন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উত্তর পত্রের একটি অংশ ছিঁড়ে যেখানে কোড নম্বর বসান হয় এবং যে অংশে পরীক্ষার্থীর রোল থাকে তা স্বতন্ত্রভাবে রেখে দেয়া হয়। পরীক্ষার পর উত্তর পত্র পরীক্ষণ ও বিভিন্ন নিরীক্ষার পর ফল প্রকাশের আগে উত্তর পত্রগুলি ডি-কোড করে নম্বর তোলা হয়। এখানে পরীক্ষকরা যেমন নিরপেক্ষভাবে উত্তর পত্র পরীক্ষা করেন, তেমনি নিরপেক্ষভাবে ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এর জন্যে আমেরিকা থেকে উত্তর পত্র মুদ্রণ ও প্রত্যেকটি উত্তর পত্রের জন্যে স্বতন্ত্র সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। সমশ্রেণীর কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, বোর্ড তার বিকল্প ব্যয়বহুল কাজে অগ্রণী থাকার কারণ সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়।

পরীক্ষার উত্তর পত্র নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার স্বতন্ত্র উপায়ও আছে। ঢাকা বোর্ড তাদের স্কুল ও কলেজের উত্তর পত্রগুলি ঢাকা বোর্ডের বাইরের শিক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন না ওঠাই স্বাভাবিক। এই শ্রেণীর নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্যে কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

শিক্ষার্থীদের উত্তর পত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বোর্ড সম্ভবত সমশ্রেণীর নীতি অবলম্বন করে থাকেন। একটি ভাল স্কুলে বা কলেজের উত্তর পত্র অন্য একটি ভাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হলে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রকৃত নম্বর অর্জন করা সম্ভব। কোন ভাল স্কুলের খাতা অপরিচিত একটি স্কুলে পাঠালে সব সময় সুবিবেচিত না-ও হতে পারে।

বোর্ডের পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগে একটা নীতি ছিল। সাধারণভাবে স্কুল ও কলেজের সিনিয়র শিক্ষককে প্রধান পরীক্ষক করা হত। কলেজের প্রফেসররা এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। এ বছরের এইচ এস সি পরীক্ষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে। একটি পত্রের পনের জন করে প্রধান পরীক্ষক নির্দিষ্ট করার সঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠের দিকটি পালিত হয়নি। তার ফলে, প্রফেসরদের চেয়ে নীচের পদের অনেক শিক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন। বোর্ড নিজের নীতিমালা পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু তার পেছনে যৌক্তিক কারণ প্রয়োজন। দু'জনের জায়গায় পনের জন শিক্ষককে প্রধান পরীক্ষক নিযুক্তি অন্যায় বলে গৃহীত না-ও হতে পারে; তবে এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার দিকও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বোর্ড যদি দক্ষতার প্রশ্ন তুলে এই শ্রেণীর নির্বাচন করে থাকেন, তাহলেও এই মতের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন সম্ভব। অধ্যাপকরা যদি যোগ্য বলে বিবেচিত না হন, তাহলে তাদের প্রমোশনের প্রয়োজন আছে কিনা তাও চিন্তা করা দরকার। এই দিকের প্রতি অবজ্ঞা করলে সরকারি প্রমোশনের হয়রানির কাঠামো ভেঙ্গে যাবে। তখন মনে করতে হবে এক জন ডেপুটি সেক্রেটারী জয়েন্ট সেক্রেটারীর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য।

এ বছরের এস এস সি ফলাফল প্রকাশের দিন সংবাদপত্রের একটা মানসিকতাও সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে ক্যাডেট কলেজের ওপর বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, প্রধান শিরোনামেই এই মানসিকতা প্রকাশিত। সংবাদপত্রগুলিতে এই শ্রেণীর শিরোনাম ছিলঃ এস এস সি পরীক্ষায় ক্যাডেট কলেজের ভরাডুবি, ক্যাডেট কলেজের ডিগবাজি, ইত্যাদি। এখানে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয় তা হলোঃ ক্যাডেট কলেজের প্রতি সংবাদপত্রের বিরূপতার কারণ কি? তাহলে কি মনে করে নেব এই শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশের পেছনে অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি প্রবল, অথবা সংবাদপত্রের কোন বিদ্বেষী মনোভাব? এর উত্তর সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র দিতে পারবেন, অন্য কেউ নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার অনেক বেশি সময় পায় এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণের একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম আছে। এ জন্যে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভাল ফলাফল করে। এর জন্যে ক্যাডেট কলেজের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের খাতার অবমূল্যায়ন যুক্তিসংগত নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডগুলির চিন্তা করা উচিত শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন করে তাদের সেই মূল্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ ক্ষেত্রে শুধু পদ্ধতির পরিবর্তন নয়। মানসিকতা পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। এই দুই মূল্যবোধ একত্রিত হলে শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃত বিচার সম্ভব।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।